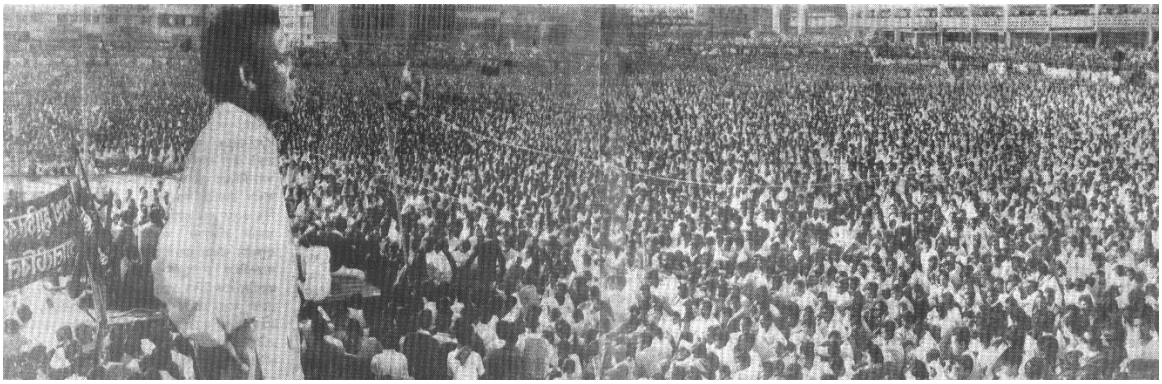

স্মৃতির পাতায় শপথ দিবস

তোফায়েল আহমেদ

মহান ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি-বিজড়িত ফেব্রুয়ারি মাস শুরু হয়েছে। মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অভিষিক্ত করতে ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই’ স্লোগান তুলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বীজ রোপণ করে আমাদের মহান নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিশ্বে মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। আর আজ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিশ্বে মর্যাদাশালী ও উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। গ্রামগঞ্জের মানুষ অর্থনৈতিকভাবে ভালো আছে। দেশের সর্বস্তরের মানুষ উন্নয়নের সুফল পাচ্ছে। রাষ্ট্র ক্রমেই জনকল্যাণমুখী হচ্ছে।

ফেব্রুয়ারি মাস আমাদের জাতীয় জীবনে বিশেষ গুরুত্ববহ। ১৯৫২-এর মহান ভাষা আন্দোলনে বাংলার সংগ্রামী ছাত্রসমাজ রাজপথে বুকের রক্ত ঢেলে মাতৃভাষা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। আর ’৬৯-এর জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে সংগ্রামী ছাত্র-জনতা দেশব্যাপী তুমুল গণআন্দোলন সংঘটিত করে দেশের মানুষের রাজনৈতিক অধিকার ‘ভোটাধিকার’ অর্জন এবং সকল রাজবন্দিসহ প্রিয়নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কারামুক্ত করে। সত্যিকার অর্থেই ’৫২-এর রক্তধারা ’৬৯-এর রক্তস্রোতে মিশে ’৭১-এ এক সাগর রক্তের বিনিময়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের উন্মেষ ঘটায়। বাঙালির জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে এ-এক ঐতিহাসিক পরম্পরা।

৬৯-এর ৪ জানুয়ারি ছাত্রলীগের ২১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ডাকসু’ কার্যালয়ে আমার সভাপতিত্বে ৪ ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডাকসু’র ভিপি হিসেবে সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক ও মুখপাত্রের দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করা হয়। আমি যথাযথভাবে সেই দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করি। সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের দশজন ছাত্রনেতার-ছাত্রলীগ সভাপতি প্রয়াত আব্দুর রউফ ও সাধারণ সম্পাদক খালেদ মোহাম্মদ আলী; ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ) সভাপতি প্রয়াত সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক ও সাধারণ সম্পাদক সামসুদ্দোহা; ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ) সভাপতি মোস্তফা জামাল হায়দার ও সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল্লাহ এবং এনএসএফ-এর একাংশের সভাপতি প্রয়াত ইব্রাহিম খলিল ও সাধারণ সম্পাদক ফখরুল ইসলাম মুন্সী; ডাকসু ভিপি হিসেবে আমি (তোফায়েল আহমেদ) ও জিএস নাজিম কামরান চৌধুরীর উপস্থিতিতে এক সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম ‘সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ’ গঠন করে-৬ দফাকে দাড়ি, কমা, সেমিকোলন সমেত ১১ দফার ৩ নম্বর দফায় অন্তর্ভুক্ত করে-ঐতিহাসিক ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষিত হয়। বাস্তবত, ১১ দফা ছিল ৬ দফারই সম্প্রসারিত রূপ। যাতে ধাবিত ছিল বাংলার মানুষের জাতীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ।

ঊনসত্তরের ২৪ জানুয়ারি গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা ১১ দফার প্রতি ছাত্রশ্রমিক-কৃষক-পেশাজীবী-বুদ্ধিজীবীসহ বাংলার সর্বস্তরের মানুষের সমর্থন আদায় করতে পেরেছিলাম। এরই প্রতিফলন দেখতে পাই আমাদের ঘোষণার স্বতঃস্ফূর্ত বাস্তবায়নে। আমরা সিদ্ধান্ত দিয়েছিলাম গুলিস্তানে-এখন যেখানে মহানগর নাট্যমঞ্চ তার পাশের পার্কটির নাম হবে শহিদ মতিউরের নামে, ‘মতিউর পার্ক’; যেটি ছিল আইয়ুব গেট, সেটির নামকরণ শহিদ আসাদের নামে, ‘আসাদ গেট’; আর দ্বিতীয় রাজধানী হিসেবে ঘোষিত আইয়ুব নগরের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়, বাংলার কৃষক দরদি নেতা শেরেবাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হকের নামে, ‘শেরেবাংলা নগর’। মুক্তিকামী বিক্ষুব্ধ জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নামগুলো পাল্টে সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে। পরম শ্রদ্ধাভরে উক্ত

স্থানগুলোতে শহিদদের নামে নামাঙ্কিত ফলক স্থাপন করা হয়। ২৪ জানুয়ারি গণঅভ্যুত্থানের পর দেশের সর্বত্র গণবিক্ষোভ এমন ছিল যে, স্বৈরশাসক ভীত হয়ে ২৫, ২৬ ও ২৭ জানুয়ারি সান্ধ্য আইন বলবৎ রাখে। ২৭ জানুয়ারি ঢাকায় গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে দেশের সর্বত্র গণবিক্ষোভ অব্যাহত থাকে। ১ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান বেতার ভাষণে রাজনৈতিক সমাঝোতার কথা বলেন। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে কারাগারে রেখে এবং ১১ দফা আদায় না হওয়া পর্যন্ত কোনো সমঝোতা হবে না পরিষ্কার জানিয়ে আমরা আইয়ুব খানের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করি। ৬ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তান সফরে এসে এক সংবাদ সম্মেলনে দেশরক্ষা আইন ও অর্ডিন্যান্সের প্রয়োগ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ১১ দফা দাবির ২ নম্বর দফাটি ছিল, 'জনসংখ্যার ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদের আসন বণ্টনসহ' 'প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বাক্ স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হইবে। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে হইবে।' এই দাবির একাংশ মেনে নিয়ে ৮ ফেব্রুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাক-এর ছাপাখানা নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেসের উপর আরোপিত বাজেয়াপ্ত আদেশ এবং দৈনিক ইত্তেফাকের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। '৬৯-এর ২৫ মার্চ আইয়ুব খান পদত্যাগ করলে ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণ করে এলএফও (লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার) জারি করে 'প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার' প্রদান ও পার্লামেন্ট নির্বাচনের ঘোষণা দেন। '৬৯-এর গণআন্দোলনে শহিদ আসাদ-মতিউর-মকবুল-রুস্তম-আলমগীর-সার্জেন্ট জহুরুল হক-ডঃ শামসুজ্জোহাসহ সকল শহিদের রক্তের শপথ নিয়ে বলেছিলাম, 'এই রক্ত আমরা বৃথা যেতে দেবো না।' শহিদের আত্মদান বৃথা যায়নি। পরবর্তী ইতিহাস তা প্রমাণ করেছে। তাদের আত্মত্যাগের ধারাবাহিকতায় আন্দোলন আরো বেগবান হয়।

৯ ফেব্রুয়ারি এক ঐতিহাসিক দিন এবং এদিনেই গণআন্দোলন ১ দফায় রূপান্তরিত হয়। এদিন পল্টন ময়দানে সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে 'শপথ দিবস' পালিত হয়। সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের দশজন ছাত্রনেতা লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে 'জীবনের বিনিময়ে ১১ দফা দাবি আদায়ের শপথ গ্রহণ' করে। জনসভা তো নয় যেন বিশাল জনসমুদ্র! চারদিক কানায় কানায় পরিপূর্ণ। তিলধারণের ঠাঁই নেই। সেদিনের সুবিশাল ঐতিহাসিক পল্টন ময়দান সংগ্রামী জনতাকে ধারণ করতে পারেনি। কাজ বন্ধ রেখে দাবি আদায়ে-কারখানার শ্রমিক, মেহনতি কৃষক, নৌকার মাঝি, জেলে, কামার, কুমার ও তাঁতী, ছাত্র, অফিসের কেরানি, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী-সকলেই জনসভায় ছুটে এসেছে প্রাণের টানে। মানুষ ঠাঁই নিয়েছে স্টেডিয়ামের দোতলা-তিনতলার বারান্দায়, কার্নিশে। যে যেখানে পেরেছে স্থান করে নিয়েছে। গণতরঙ্গে উত্তাল বিশাল সেই জনসভায় আগত জনসাধারণ ছিল শৃঙ্খলাবদ্ধ। তাদের মুখে ছিল স্বাধিকারের দৃপ্ত স্লোগান, আর চোখ-মুখ ছিল দুর্জয় সঙ্কল্পে অটল। সেই অভূতপূর্ব দৃশ্যপট এখনো আমার স্মৃতিতে অম্লান। দেশের বিভিন্নমুখী সমস্যার উল্লেখ করে, ঐতিহাসিক ১১ দফা দাবি ব্যাখ্যা করে, ছাত্রদের রাজনীতি করার যৌক্তিকতা তুলে ধরে, আইয়ুব খান প্রস্তাবিত গোল টেবিল বৈঠক প্রশ্নে ছাত্রসমাজের অভিমত ব্যাখ্যা করে দশজন ছাত্রনেতার প্রত্যেকের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল, 'অবিলম্বে আইয়ুব খানের পদত্যাগ, বর্তমান শাসনতন্ত্র বাতিল, রাজবন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তি এবং ১১ দফা দাবির ভিত্তিতে দেশের জন্য একটি সম্পূর্ণ নূতন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের লক্ষ্যে 'এক মাথা এক ভোট' দাবি অনুযায়ী প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ ভোটে গণপরিষদ গঠন।' সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক এবং সভার সভাপতি হিসেবে পিন-পতন নীরবতার মধ্যে একটানা ৪৫ মিনিট বক্তৃতা করি। সেদিনের বক্তৃতায় "প্রেসিডেন্টের প্রস্তাবিত আলোচনা বৈঠকের ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য ছাত্র-জনতার কতিপয় দাবি আদায়ে দেশে স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের আহ্বান জানাই। ছাত্র-জনতার সম্মিলিত আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণের পত্রিকা 'ইত্তেফাক'কে আমরা ছিনিয়ে এনেছি। দেশরক্ষা আইনের প্রয়োগ বন্ধ করেছি। মোজাফফর, আলতাফ প্রমুখ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে কারাগার হতে মুক্ত করেছি। অপরাপর রাজবন্দীদেরকেও আমরা মুক্ত করবো। এ দেশের যে প্রিয় নেতা জন্মের পর হতে বাংলার মানুষের জন্য সংগ্রাম করেছেন, জেল-জুলুম নির্যাতন সহ্য করেছেন, সেই শেখ মুজিবুর রহমানকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। ছাত্রজনতার দাবি যদি পূরণ না করা হয়, শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দির যদি মুক্তি দেওয়া না হয়, তাহলে বাংলার ঘরে ঘরে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটবে। সমগ্র পাকিস্তানে জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ জন বাঙালি। অতএব, আমাদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। স্বৈরশাসক আইয়ুব খান রচিত 'ফ্রেন্ডস নট মাস্টার' গ্রন্থটি বাংলার কোনো ঘরে যেন না থাকে। রাজনীতির অর্থ যদি হয় শ্রমিক-কৃষকের অধিকার নস্যাৎ করা, জনগণের মৌলিক অধিকার হরণ করা, ছাত্রসমাজ সেই রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। কিন্তু রাজনীতির অর্থ যদি হয়, দেশের ছাত্র-কৃষক-শ্রমিকের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য নূতন সমাজ গঠন করা-ছাত্রসমাজ সেই রাজনীতি অবশ্যই করবে। ছাত্রদের ১১ দফা এই দৃষ্টিতেই প্রণীত হয়েছে এবং এই ১১ দফা কৃষক-শ্রমিক মেহনতি মানুষের মুক্তি সনদ। আমরা শিল্পপতি-জমিদারের ছেলে নই, আমরা কৃষক-মজুর-মধ্যবিত্তের সন্তান। আমাদের মাতাপিতার যদি অধিক ট্যাক্স দিতে হয়, তারা যদি পাটের ন্যায্য মূল্য না পান তাহলে আমাদের পড়াশোনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ছাত্রদের পড়াশোনার সাথে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বিচ্ছিন্ন নয়। পূর্ব বাংলার মানুষ বিশ্বাসঘাতকতার রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়। পিতাল্যাণের রাজনীতিই তাদের ধর্ম। ভবিষ্যৎ বংশধরদের মনে বিষ ছড়াবার জন্য শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়ানো হচ্ছে। মিল মালিকদের হুঁশিয়ার করে বলছি, নিজেদের ভাগ্য গড়ার সঙ্গে সঙ্গে অচিরেই তারা যেন শ্রমিকদের ন্যায্য পারিশ্রমিক দানের ব্যবস্থা করেন। যাতে ভবিষ্যতে তারা আর নিজেদের ফরিয়াদ জানাতে ছাত্রদের কাছে ধর্ণা দিতে বাধ্য না হয়। অন্যথায় দেশের ছাত্রসমাজ তাদের ক্ষমা করবে না।" বক্তৃতার শেষে সমবেত জনতার তুমুল গর্জনের সাথে বজ্রকণ্ঠে স্লোগান তুলি-'শপথ

নিলাম শপথ নিলাম মুজিব তোমায় মুক্ত করবো; শপথ নিলাম শপথ নিলাম মাগো তোমায় মুক্ত করবো।' ভাবতে আজ কতো ভালো লাগে ঐতিহাসিক শপথ দিবসের এই স্লোগানের দু'টি লক্ষ্যই সংগ্রাম ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জন করেছি। সোনার বাংলার ৩৯ জন সোনার সন্তানের প্রাণের বিনিময়ে '৬৯-এর ২২ ফেব্রুয়ারি প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে মুক্ত করে, '৭০-এর ঐতিহাসিক নির্বাচনে ৬ দফা ও ১১ দফার পক্ষে গণরায় নিয়ে, '৭১-এর মহত্তর মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষাধিক মানুষের সুমহান আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে ১৬ ডিসেম্বর প্রিয় মাতৃভূমিকে হানাদার মুক্ত করে সেদিনের সেই শপথবাক্য আমরা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করেছি। এরপর ১৪ ফেব্রুয়ারি 'ডাক'-এর (ডেমোক্র্যাটিক অ্যাকশন কমিটি) আহ্বানে অর্ধদিবস হরতাল পালন ও পল্টনের জনসভায় জনতার দাবির মুখে প্রিয় নেতার ছবি বুকে ঝুলিয়ে বক্তৃতা করি। সেদিনের জনসভায় সংগ্রামী জনতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আপনারা কী প্রিয় নেতা শেখ মুজিব ছাড়া গোলটেবিল বৈঠক চান? আপনারা কী প্রিয় নেতা শেখ মুজিবের প্যারোলে মুক্তি চান?' জনতা সমস্বরে বলেছিল, 'না, চাই না।' তখন বঙ্গবন্ধুর প্যারোলে মুক্তির কথা প্রচার করা হয়েছিল। এ-ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর প্রিয় সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন।

৬৯-এর ২৪ জানুয়ারি সর্বব্যাপী গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গণআন্দোলন সমগ্র জাতিকে উজ্জীবিত করে ৯ ফেব্রুয়ারি এক মোহনায় শামিল করেছিল। সেদিন পল্টনের জনসভা শেষে সংগ্রামী ছাত্র-জনতার বিক্ষুব্ধ মিছিল ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে স্লোগান দিতে থাকে। পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কায় আমরা তৎক্ষণাৎ সেখানে যাই এবং বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতাকে শান্ত করে ইকবাল হলে (বর্তমান শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) ফিরিয়ে আনি। স্বৈরশাসকের শত উস্কানি সত্ত্বেও আমরা নৈরাজ্যের পথে যাইনি। নিয়মতান্ত্রিকভাবেই আন্দোলন করেছি। নিজেদের মধ্যে মত ও পথের ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও আমরা সেদিন ১১ দফা দাবি আদায়ের প্রশ্নে ছিলাম ঐক্যবদ্ধ। দলীয় আদর্শ নিয়ে পরস্পরের মধ্যে মতদ্বৈততা থাকলেও আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্ক ছিল চমৎকার। এক টেবিলে বসেই আহার করতাম। বিপদে-আপদে একে অপরের খবর নিতাম এবং হৃদ্যতাপূর্ণ এই সম্পর্কই ছিল আমাদের আন্দোলনের ভিত্তি। '৬৯-এর গণআন্দোলনে আমাদের সংগ্রামী ভূমিকা, কর্মসূচি পালনে নিষ্ঠা, সততা ও জনদরদি আবেদন মানুষের হৃদয়ে এতোটাই সাড়া জাগিয়েছিল যে, বাংলার মানুষ আমাদের মাথায় তুলে নিয়েছিল। ইতিহাসের সেই গৌরবোজ্জ্বল সোনালি দিনগুলোর দিকে যখন ফিরে তাকাই, তখন ফেলে আসা সংগ্রামী দিনগুলোর জ্যোতির্ময় বৈপ্লবিক বহিঃপ্রকাশ-অনন্য-সাধারণ মনে হয়!

আজ সেই সোনালি অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করলে মনে হয় কী করে এটা সম্ভব হলো? তখন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর বিচার চলছে। 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য' অর্থাৎ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বলে যে মামলাকে অভিহিত করা হয়েছিল সেই মামলার বিচার চলছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তখন ফাঁসির মঞ্চে। আমরা জাগ্রত ছাত্রসমাজ শুধু ঐক্যবদ্ধ হইনি, গোটা জাতিকে আমরা ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। আমরা যখন পল্টনে মিটিং করি, তখন সচিবালয়ের সমস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী অফিস বন্ধ করে এই পল্টনের জনসভায় ছুটে আসতো। সেদিনের জনসভাগুলো শুধু পল্টন ময়দানেই সীমাবদ্ধ থাকতো না, আশপাশের এলাকাসহ সমগ্র মতিঝিল, শাপলা চত্বর থাকতো কানায় কানায় পরিপূর্ণ। সেই দিনগুলোতে আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা সর্বব্যাপী গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টি করেছিলাম; শপথ দিবসের সেই জনসমুদ্রে লক্ষ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে মরণপণ শপথ নিয়েছিলাম; ১৪ ফেব্রুয়ারি পল্টন ময়দানে রাজনৈতিক দলসমূহের জোট 'ডেমোক্র্যাটিক অ্যাকশন কমিটি' তথা 'ডাক'-এর মানুষ নুরুল আমিনকে প্রত্যাখ্যান করে মঞ্চে আমাদেরকে তুলে নিলে যে বক্তৃতা আমরা করেছিলাম, যে ম্যান্ডেট আমরা নিয়েছিলাম, সেই ম্যান্ডেট আমরা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করেছি। সেদিন ১৫ ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহরে রাত্রিবেলা সার্জেন্ট জহুরুল হককে হত্যা করে আবার কারফিউ জারি করা হয়, ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহাকে-যিনি নিজের বুক পেতে দিয়ে বলেছিলেন, 'আমার ছাত্রদের গুলি করার আগে আমার বুকে গুলি চালাতে হবে', তখনই তাঁর বুকে প্রথমে গুলি পরে বেয়নেট চালিয়ে তাঁকে-নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। যার প্রতিবাদে সমগ্র দেশ গণজাগরণ-গণবিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে এবং অমর একুশে ফেব্রুয়ারির ঐতিহাসিক দিনে পল্টন ময়দানে লক্ষ লক্ষ লোকের সামনে যখন প্রিয় নেতা শেখ মুজিবকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিঃশর্ত মুক্তিদানের আলটিমেটাম দিয়েছিলাম, যার পরিপ্রেক্ষিতে ২২ ফেব্রুয়ারি প্রিয় নেতাকে মুক্তি দিতে স্বৈরশাসক বাধ্য হয়েছিল। তেইশে ফেব্রুয়ারি আমরা সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে আজকের সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গণসংবর্ধনা প্রদান করি। আমি সৌভাগ্যবান মানুষ যে সেই সভায় সভাপতিত্ব করার দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী। সভার সভাপতি হিসেবে সবার শেষে বক্তৃতা দেওয়ার কথা। কিন্তু ১০ লক্ষাধিক লোকের সম্মতি নিয়ে প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুর আগেই বক্তৃতা করেছিলাম।

বক্তৃতার এক পর্যায়ে বলেছিলাম, যে নেতা জীবনের যৌবন কাটিয়েছেন পাকিস্তানের কারাগারে, ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গান করেছেন, সেই নেতাকে কৃতজ্ঞ বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞ চিত্তে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করলাম। ১০ লক্ষাধিক লোক ২০ লক্ষাধিক হাত উত্তোলন করে আমাদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে বলেছিল 'জয় বঙ্গবন্ধু'। নয়ই ফেব্রুয়ারির পর আমাদের জাতীয়

নেতা তাজউদ্দীন আহমদ, যুব নেতা শেখ ফজলুল হক মণি, আবদুর রাজ্জাক, রাশেদ খান মেনন, ছাত্র নেতা নূরে আলম সিদ্দিকীসহ যারা কারাগারে বন্দি ছিলেন তারা সকলেই এবং পরবর্তীকালে পর্যায়ক্রমে মণি সিংহ, মতিয়া চৌধুরীসহ সকল রাজবন্দি মুক্তিলাভ করেন। আগরতলা মামলায় ৩৫ জন আসামি ছিলেন। তন্মধ্যে সার্জেন্ট জহুরুল হক শহিদ হন। আর বাকি ৩৪ জনকে নিঃশর্ত মুক্তিদানে স্বৈরশাসক বাধ্য হয়। তখন কারাগার রাজবন্দি শূন্য। নয়ই ফেব্রুয়ারি আন্দোলন আর ১১ দফার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। সেদিন আন্দোলন এক দফায় চলে যায়। প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে মুক্ত করেই আমরা ঘরে ফিরেছি।

স্মৃতির পাতায় ভেসে ওঠে আরও শপথ দিবসের কথা। যেটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল '৭০-এর নির্বাচনের পর '৭১-এর ৩ জানুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে। নবনির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের সাথে সেদিন আমারও শপথ গ্রহণের সৌভাগ্য হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা শপথ নিয়েছিলাম। বঙ্গবন্ধু সেদিন বলেছিলেন, '৬ দফা আজ আমার না, ৬ দফা আজ আওয়ামী লীগের না; এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ৬ দফা জনগণের সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। কেউ যদি ৬ দফার সাথে বিশ^াসঘাতকতা করে তবে তাকে জ্যান্ত কবর দেওয়া হবে এবং আমি যদি করি আমাকেও।' আবার আমরা শপথ নিয়েছিলাম '৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ভারতের দেরাদুনে। মুজিব বাহিনীর অন্যতম অধিনায়ক হিসেবে মুজিব বাহিনীর সদস্যদের পাহাড়ের উপর ৭ হাজার ফুট উচ্চতায় ট্রেনিং শেষে রণাঙ্গনে পাঠাবার প্রাক্কালে শপথ গ্রহণ করাতাম এই বলে যে, 'প্রিয় নেতা, তুমি কোথায় আছো, কেমন আছো জানি না! যতদিন আমরা প্রিয় মাতৃভূমি তোমার স্বপ্নের বাংলাদেশকে হানাদার মুক্ত করতে না পারবো, ততদিন আমরা মায়ের কোলে ফিরে যাবো না।'

প্রতি বছর এই দিনগুলো জাতীয় জীবনে ফিরে আসে। আনন্দের বিষয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর প্রতিটি মিটিংয়ে-আমি তাঁর সফরসঙ্গী হিসেবে যেতাম-যখন বক্তৃতা করতেন, সেই '৫২-এর মহান ভাষা আন্দোলন, আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন, '৬৬-এর ৬ দফা আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের কথাগুলো বলতেন। ঐতিহাসিক সাতই মার্চের বক্তৃতায়ও তিনি '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের কথা উল্লেখ করেছেন। আমার লাইব্রেরি রুমে বসে যখন '৬৯ ও '৭১-এর সেই সোনালী দিনগুলোর ছবি ও পত্রিকার পাতা জুড়ে প্রতিবেদনগুলো দেখি, তখন আনন্দে বুক ভরে যায় এই ভেবে যে, একদিন আমরা গৌরবোজ্জ্বল এই দিনগুলো সৃষ্টি করেছিলাম।

লেখক ঃ আওয়ামী লীগ নেতা; সংসদ সদস্য; সভাপতি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ। tofailahmed69@gmail.com

০৮.০২.২০২২ পিআইডি ফিচার